Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন ও হাদিসে আলোকে প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছামিয়া আক্তার খান

রোলঃ 23100121280

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন ও হাদিসে আলোকে প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছামিয়া আক্তার খান

রোলঃ 23100121280

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কোরআন ও হাদিসে আলোকে প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ছামিয়া আক্তার খান, আইডিঃ 23100121280 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কোরআন ও হাদিসে আলোকে প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ছামিয়া আক্তার খান

আইডিঃ 23100121280

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
একজন আলেমের পরিচয় ও মর্যাদা 9
আলেমের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী :.. 15
আলেমের প্রকারভেদ: 20
একজন আলেমের ইলমি দায়িত্ব 23
সমাজ সংস্কারে আলেমের দায়িত্ব 26
দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফ 29
নেতৃত্ব ও শূরার দায়িত্ব 33
আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া 36
উম্মাহর ঐক্য রক্ষা 39
উপসংহার 40

ভূমিকা

ِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين، أما بعد

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহর রাসুলের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের (সাহাবিদের) ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। অতঃপর...

الحمد لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق هاديًا إلى الخيرات داعيًا أبلغ رسالته ربه، والأمين على وحيه، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا منهجه واهتدوا بهديه، وعلى من سار على طريقهم واتبع آثارهم إلى يوم الحشر والنشور.

"আলিম" অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি উপাধি, একটি গৌরবময় পদবি, যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কেবল তাঁর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের দান করে থাকেন। আলিমগণ হলেন সম্মানিত নবী-রাসূলগণের ওয়ারিস ও খলিফা। উপরন্তু, আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে তাদের বহু মর্যাদা ও বিশেষ ফজিলত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। তোমরা যা কিছু করো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ খবর রাখেন।"

[সুরা আল মুজাদালাহ]

রাসূলিল্লাহ ﷺ— বলেন

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ পাড়ি দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের রাস্তা সমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। এ ছাড়া একজন আলিমের জন্য আসমান ও জমিনের সবকিছু, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর ইবাদতে মশগুল ব্যক্তির ওপর আলিমের মর্যাদা পূর্ণিমার রাতে সকল নক্ষত্রের ওপর চাঁদের মর্যাদার মতোই। আলিমগণ হলেন নবিগণের উত্তরাধিকারী।
(জেনে রেখো,) নবিগণ কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থাৎ অর্থসম্পদ) রেখে যাননি—(যা তাদের পর আলিমগণ উত্তরাধিকারিসূত্রে তার মালিক হবে); বরং তারা (সম্পদরূপে কেবল) ইলমই রেখে গেছেন। কাজেই যারা তা অর্জন করল, তারা বেরা ভালো সম্পদ অর্জন করল।'
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَىٰ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ

"পৃথিবীর আলিমগণের উদাহরণ হলো আকাশের নক্ষত্রের মতো, যাদের মাধ্যমে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। নক্ষত্রগুলো নিষ্প্রভ বা অদৃশ্য হয়ে গেলে পথ-নির্দেশকরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে।"
[প্রকৃত আলেমের সন্ধানে]

মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নেয়ামতগুলোর একটি হলো "হিদায়াত"। আর এই হিদায়াত মানুষের কাছে পৌঁছেছে নবীদের মাধ্যমে। নবীদের পরে এই দায়িত্ব বহন করেন আলেমগণ। তাই ইসলামি সভ্যতায় আলেম শুধু একজন শিক্ষক নন; বরং তিনি—
উম্মাহর পথপ্রদর্শক,
দ্বীনের রক্ষক,
এবং কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যাকারী।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু স্থানে ইলম ও আলেমদের মর্যাদা তুলে ধরেছেন।

তাই ইসলামি সভ্যতায় আলেম শুধু একজন শিক্ষক নন; বরং তিনি—

উম্মাহর পথপ্রদর্শক,

দ্বীনের রক্ষক,

এবং কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যাকারী।এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু স্থানে ইলম ও আলেমদের মর্যাদা তুলে ধরেছেন।কুরআনের দৃষ্টিতে আলেম হওয়া সম্মানের পাশাপাশি ভয়ংকর দায়িত্ব।এ কারণে প্রকৃত আলেম অনেক সময়:

নির্যাতিত হয়েছেন,

কারাবন্দী হয়েছেন,তাই

কিন্তু সত্য থেকে পিছিয়ে যাননি।তাই আমাদের জীবনে আলেমেদের দায়িত্ব অনেক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

আজকের এই ডিজিটাল যুগে,

জনপ্রিয়তা,

সোশ্যাল মিডিয়া,

সুন্দর বক্তব্য,

তাই এসব দেখে মানুষ কাউকে আলেম ভাবতে পারে।

কিন্তু ইসলামে প্রকৃত মর্যাদা নির্ভর করে:

তাকওয়া,

সহিহ আকিদা,

ইখলাস,

ও আমলের উপর।

আলেমগণ হচ্ছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের পথের আশার আলো। আলেমগন হচ্চেন নবিদের প্রকৃত উত্তারাধিকারি। আলেমেগন সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন বা পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে থাকেন।আলেমগন সাধারণ মানুষের কাছে ইসলাম একটি মনোনীত নিত ধর্ম হিসেবে পরিচয় দিয়ে সত্যের দিকে পরিচালিত করেন।

কুরাআনের দৃষ্টিতে আলেম শুধু বেশি তথ্য জানাআছে তা না বরং যিনি আল্লাহকে ভয় করেন তায়ার আদেশ নিষেধ মানেন এবং মানুষকে পথ দেখান ।আলেমরা আল্লাহর

দেয়া নেয়ামত বোঝেন , আখিরাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানেন এবং বোঝেন, গুনাহের পরিনতি সম্পর্কে জানেন সাধারণ মানুষ হয়তো গুনাহকে ছোট করে দেখতে পারে, কিন্তু প্রকৃত আলেম ছোট গুনাহকেও ভয় করেন। আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। যার ইলম যত বেশি তার আল্লাহর সম্পর্কে উপলব্ধি ও তত বেশি গভির হয় আরও প্রকৃত ইলম অর্জন করে তাকে বিনয়ী আলেমও বনায়। সত্যিকারের আলেম সবসময় আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, কখনো দুনিয়ার লোভের জন্য দ্বীন বিকৃত করেন না।একজন আলেমের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা কাছে অনেক গুন বেশি সাধারন বান্দার থেকে যদি প্রকৃত আলেম হওয়ার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন ,

আল্লাহ যাকে কল্যাণ চান তাকে ইলম দেন।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

“তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।”

[সুরা আল বাকারাহ]

একজন আলেমের পরিচয় ও মর্যাদা

আলিমের পরিচয়

ইলম ও আলিমের সংজ্ঞা

‘আলিম’ শব্দটি আরবি। এটি ‘ইলম’ থেকে গঠিত কৃতকারক বিশেষ্য। ‘ইলম’ শব্দটি কখনো ক্রিয়ামূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো ক্রিয়া বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ামূল হিসেবে এর আভিধানিক অর্থ হলো— কোনো কিছু জানা, বোধগম্য হওয়া, কোনো বস্তুর পরিচয় ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

আলিম অর্থ জ্ঞানী, বিদ্বান, বিজ্ঞানী। কারো কারো মতে, মূলত ইলম হল ادراك (বোধ,চিন্তা বা মানস রচনা) قواعد (সূত্র ও বিধিবদ্ধতা)ও ملكت(প্রতিভা)এর সমষ্টি। আর ক্রিয়া বিশেষ্য হিসেবে এর অর্থ বোধ,জ্ঞান বিজ্ঞান।
এখানে ادراك (ইদরাক) দ্বারা কোনো বিষয়ের চিন্তা, উপলব্ধি ও মানস রচনাকে বুঝানো হয়েছে قواعد (কাওয়াঈদ) বলতে নির্দিষ্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণীত নানা সূত্র, বিধি ও পরিভাষাগুলোকে বোঝানো হয়েছে, আর ملكت(মালাকাত) দ্বারা নির্দিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্য লাভের ফলে অর্জিত দক্ষতা ও পরিপক্কতা থেকে সৃষ্ট প্রতিভাকে বোঝানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, ملكت (প্রতিভা /দক্ষতা) প্রচুর চিন্তা ও মানস রচনা এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। এ মতানুসারে যেকোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যাক্তিকে আলিম বলা যায় - চাই তিনি পদার্থবিদ হন কিংবা গণিতবিদ হন অথবা চিকিৎসক বা প্রকৌশলী কিংবা শারিয়াহ বিশেষজ্ঞ হন..।
কিন্তু এ গ্রন্থে ‘আলিম’ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য যেকোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিকে বোঝানো নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শরিয়াহর নির্দিষ্ট পরিভাষায় ‘আলিম’-এর পরিচয় তুলে ধরা।
অর্থাৎ, ইসলামে আলিম বলতে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলোকিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়।

উল্লেখ্য,
ইসলামে ‘ইলম’ একটি অত্যন্ত পবিত্র পরিভাষা। কুরআন ও হাদীসে এর নানা ফজিলতের কথা উল্লেখ রয়েছে। ইসলামে ইলমকে ‘নূর’ (আলো) বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

কাজেই ইলমের জন্য কেবল দ্বীন ও শরিয়াহ সম্পর্কে বেশি জানাটাই মুখ্য বিষয় নয়; বরং যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেই ভিত্তিতে আলোকিত হওয়াটাই মুখ্য বিষয়। সুতরাং আলিম হলো এমন ব্যক্তি, যিনি দ্বীন ও শরিয়াহর জ্ঞান লাভের পাশাপাশি নিজেকেও একজন আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন।

[প্রকৃত আলেমের সন্ধানে]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*-এ আলেমের পরিচয়, দায়িত্ব ও সমাজে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে, আলেম হলেন সেই মহান ব্যক্তি যিনি কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন, তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেন এবং মানুষের মাঝে তা প্রচার করেন। আলেম শুধু বইপুস্তকের জ্ঞানী নন; বরং তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নবী (সা.)-এর উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আলেমের প্রধান কাজ হলো মানুষের কাছে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। তিনি মানুষকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম শেখান, হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান দেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। সমাজে যখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে, তখন আলেমরা তা দূর করে মানুষের চিন্তাধারাকে সংশোধন করেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) আরও উল্লেখ করেন যে,
আলেমরা সমাজের সংস্কারক । তারা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি সাধনে কাজ করেন এবং সমাজে ন্যায়, সত্য ও দ্বীনের বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁদের

মাধ্যমে দ্বীনের হেফাজত হয় এবং ইসলামের শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত থাকে।

কুরআন ও হাদিসেও আলেমদের উচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

জ্ঞানী ও অজ্ঞ কখনো সমান হতে পারে না। এতে আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, আলেমরা নবীদের উত্তরসূরি। এই কারণে আলেমদের সম্মান করা এবং তাঁদের কাছ থেকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আলেমরা সমাজের জন্য আলোর দিশারী। তারা মানুষের অন্তর থেকে অন্ধকার দূর করে হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা যাদের ভালোবাসেন, তাদের জন্য আসমান ও জমিনে গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।

তাই প্রকৃত আলেমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত।

আলেমরা সমাজের জন্য আলোর বাতিঘর। তারা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান, বিভ্রান্তি থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে চলার অনুপ্রেরণা দেন। তাদের জ্ঞান শুধু নিজের জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য কল্যাণকর।

একজন প্রকৃত আলেম তার জ্ঞানকে মানুষের হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) আরও তার লেখায় বলেছেন ,

আলেমদের মাধ্যমে দ্বীনের হেফাজত হয় এবং ইসলামের শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত থাকে।

যদি আলেম না থাকতেন, তাহলে মানুষ ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যেত

এবং সমাজে ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ত।

আলেমদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বিনয় ও তাকওয়া। প্রকৃত আলেম কখনো অহংকারী হন না; বরং তিনি আল্লাহর ভয় নিয়ে জীবনযাপন করেন এবং

মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি নিজের জ্ঞানকে গর্বের বিষয় না বানিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।

[হুজ্জাতুল্লাহ আল বালীগাহ]

একজন আলেম হচ্ছেন তিনি যিনি কোন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন তাকে সাধারন ভাবে আলেম বলা হয়। ইলমওয়ালা জ্ঞানী বিদ্ধান তাকেই আলেম বলা হয়ে থাকে।
কিন্তু ইসলামি শরিয়াত অনুযায়ী প্রকৃত আলেম হচ্চেন ,
সেই ব্যাক্তি যিনি কুরআন ও হাদিসের গভীর জ্ঞান লাভ করেছেন। যিনি ইসলামের সব বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ও বুঝেন। মানুষকে সঠিক দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং নিজের জীবনেও সেই ইলম প্রয়োগ করে থাকেন , তাকওয়া ও ইখলাসের সাথে ইলম চর্চা করেন এবং নিজের
জীবনেও তা অনুসরন করে থাকেন। আলিম শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি নন; বরং তিনি এমন একজন আলোকিত মানুষ, যিনি ইলম, আমল, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সমাজকে সঠিক পথ দেখান।
ইসলামে আলিমদের মর্যাদা এত বেশি হওয়ার কারণ হলো— তারা নবীদের জ্ঞান ও দ্বীনের উত্তরাধিকার বহন করেন।

একজন আলেমের মর্যাদা

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভি (রহ)তার লেখা হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগাহ এ আলেম শুধু জ্ঞানী ব্যাক্তি হিসেবে দেখেন নি বরং তিনি আলেমকে নবিদের উত্তারাধিকার হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।
আলেমদের সম্মান করা, তাদের কথা শোনা এবং তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করা মুসলমানদের জন্য অতন্ত্য গুরুত।

ইসলামের শরীয়ত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, আল্লাহ পাকের কিছু উত্তম বান্দা রয়েছেন। তাঁরা হলেন উচ্চ মর্যাদার আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যাক্তিগণ।পূণ ।

যে ব্যক্তি নিজেকে পুণ্যবান রূপে গড়ে তোলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ রেখে পূত চরিত্রের অধিকারী হন, এবং মানব সমাজের সংস্কার ও কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন, সেই ফেরেশতারা তার জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকেন।

ফলে তার ওপর রহমত ও বরকত নাযিল হয়। এ ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমান ও ফেতনা সৃষ্টিকারী বান্দাদের ওপর বদ-দোয়া ও অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাদের এ বদ-দোয়া ও অভিসম্পাতের কারণে পরিণামে নাফরমানদের অনুতপ্ত হতে হয়। আর সে কারণেই নিম্নতর আকাশের ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। খারাপ ব্যবহার করার জন্য ইলহামেও জানানো হয় ।

[হুজ্জাতুল্লাহ আল বালীগাহ]

একজন প্রকৃত আলেমের জ্ঞান তার চরিত্রে প্রকাশ পায় । তার আচরণ, কথা, ও আমলে মানুষকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করে । তার ফলে আলেমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করে থাকেন । ঐই প্রকৃত আলেমরাই কিয়ামতের দিন অধিক মর্যাদা পাবেন সাধারন মানুষদের তুলনায় তারা আল্লাহর আরশের চায়ায় থাকবেন ।

১.প্রকৃত আলেমরা আল্লাহভীরুতা :

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ُ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
[সূরা ফাতির]

২.একজন আবিদের তুলনায় একজন আলেমের মর্যাদা অনেক বেশি

ورَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هذِهِ الاَيَةً (اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمَاءُ) وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ اِلى آخِرِه

মাকহূল (রহ) থেকে বর্ণিত

দারিমী এ হাদীসে মাকহূল (রহঃ) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেন, ‘আবিদের তুলনায় ‘আলিম এমন মর্যাদা,যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা।
এছাড়া তার হাদীসের অবশিষ্টাংশ তিরমিযীর বর্ণনা।

৩. আল্লাহ ইলমওয়ালাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা বহু স্তরে উন্নীত করবেন।

[সূরা আল মুজাদালাহ]

যারা আল্লাহ এর জন্য ইসলামের বিধি বিধান এবং আল্লাহ সম্পর্কে ইলম অর্জন করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন।

৪. প্রকৃত আলেমরা কুরআনের নিদর্শন বুঝে

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُو

“আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি; কিন্তু আলেমরাই তা বুঝে।”
[সূরা আনকাবুত]

আলেমের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী :

আলিমের উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অনুসারে একজন ব্যক্তি 'আলিম' হিসেবে অভিহিত হওয়ার জন্য তাকে কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। এই যোগ্যতা ও গুণগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : ক. একাডেমিক, খ. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক।

ক. একাডেমিক যোগ্যতা :

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন প্রকৃত আলিম মানেই মুজতাহিদ। জ্ঞান-গরিমা, চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষমতা প্রভৃতি বিচারে যেমন মুজতাহিদগণের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে, তেমনি আলিমগণের মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ হলেন সাধারণ স্তরের আলিম, কেউ হলেন মধ্যম পর্যায়ের বিশিষ্ট আলিম, আর কেউ হলেন মুজতাহিদদের পর্যায়ভুক্ত আলিম। আমরা নিচে একজন সাধারণ স্তরের আলিমের প্রয়োজনীয় একাডেমিক যোগ্যতাসমূহ তুলে ধরছি।

১. আল কুরআনুল কারীম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

কুরআন হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার প্রথম ও প্রধান উৎস। সুতরাং আলিম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আল কুরআন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য, পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখিত সকল বিধিবিধান এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন তার গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য যে সকল আনুষঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় (যেমন : নাসেখ-মানসূখ, আয়াত নাযিলের উপলক্ষ ও প্রেক্ষাপট প্রভৃতি), সেসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। একজন আলেমকে শুধু কুরআন তিলাওয়াত জানলেই যথেষ্ট নয়; বরং কুরআনের অর্থ, তাফসীর, বিধিবিধান, উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হয়। পাশাপাশি কোন আয়াত কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, কোন আয়াতের সঙ্গে কোন আয়াতের সম্পর্ক, নাসেখ-মানসূখ, আম-খাস, মাক্কী-মাদানী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও অবগত থাকা প্রয়োজন।

কুরআনের জ্ঞান ছাড়া একজন আলেম পূর্ণাঙ্গ আলেম হতে পারেন না; কারণ কুরআনই দ্বীনের মূল উৎস ও পথনির্দেশনা।”

এ কারণে একজন আলেমের জন্য কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

২. হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

কোরানের পরে ইসলামী শরিয়ার দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর হাদিস। এটি মূলত কোরআনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগিক রূপ। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে হাদিস ব্যতীত কোরআনের নির্দিষ্ট প্রকৃত রোগ রূপ মর্মদ্ধার করাও সম্ভব নয়। কাজেই আলিম হওয়ার জন্য কোরআনের পর হাদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বলা বাহুল্য,

বর্তমানে হাদীসের অসংখ্য বিশাল বিশাল সংকলন পাওয়া যায়। সেগুলোতে সহীহ-যঈফ-মাওযূ মিলিয়ে অজস্র হাদীস বর্ণিত আছে।

যেহেতু কারো পক্ষে সকল হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, তাই অন্ততপক্ষে একজন আলিমকে সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ও সুনানে আরবাআহতে (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে-তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ) উল্লেখিত সকল হাদীস, বিশেষ করে বিধিবিধানসংবলিত সকল হাদীস সম্পর্কে জানতে হবে। তবে এসব হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরী নয়। হাদীসটি কোন অধ্যায়ে আছে এবং প্রয়োজনের সময় হাদীসটি সহজে বের করতে পারাটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। তদুপরি একজন আলিমের জন্য যেমন হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম, তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় (যেমন—হাদীসের পরিভাষা ও উসূলে ফিকহ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, রাবীদের অবস্থা, নাসেখ-মানসূখ প্রভৃতি) সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

তবে জারহ ও তা‘দীলবিষয়ক সকল কিছু মুখস্থ থাকা আলিমের জন্য আবশ্যক নয়; বরং হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক রচিত ‘জারহ ও তা‘দীল’-বিষয়ক কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভালোভাবে জানা থাকা কিংবা হাদীসগুলো সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য জানা থাকা বা প্রয়োজনে খুঁজে বের করতে পারাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

৩.একজন আলেমের আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন

একজন আলেমের জন্য ইসলামী আকিদা সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও গভীর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ আকিদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও ঈমানের মূল। একজন মানুষের চিন্তা, আমল, ইবাদত ও জীবনব্যবস্থা— সবকিছুই আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

একজন আলেমকে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ, তাঁর গুণাবলি, রিসালাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, আখিরাত, তাকদীর এবং ঈমান সম্পর্কিত সকল মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে হয়। পাশাপাশি ইসলামবিরোধী ভ্রান্ত আকিদা, বাতিল মতবাদ ও বিভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কেও অবগত থাকতে হয়, যাতে তিনি মানুষকে সঠিক আকিদার দিকে আহ্বান করতে পারেন।

৪. ইজমা সম্পর্কে সম্যক অবগতি

ইজমা : অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেসব বিষয়েও একজন আলিমকে অবগত থাকতে হবে। কারণ, সেসব বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-গবেষণা করার অবকাশ খুব একটা থাকে না; বরং সেসব ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত মতটিই প্রাধান্য পাবে।

৫.একজন আলেমের কিয়াস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন

একজন আলেমের জন্য কুরআন, হাদীস ও ইজমার পাশাপাশি কি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা, যুগে যুগে এমন বহু নতুন মাসআলা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তখন মুজতাহিদ আলেমগণ কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি ও পূর্ববর্তী মাসআলার সঙ্গে তুলনা করে শরয়ী বিধান নির্ধারণ করেন, আর এই প্রক্রিয়াকেই কিয়াস বলা হয়।কিয়াসের মাধ্যমে একজন আলেম নতুন যুগের জটিল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হন।

৬.উসূলুল ফিকহ-এর উপর ব্যাপক জ্ঞান

একজন আলিমকে উসূলুল ফিকহ তথা ইসলামী আইন-এর উপর গবেষণা করার মূলনীতি, ইসলামী আইনের মৌলিক ও সহায়ক দলিলসমূহ এবং এগুলোর প্রয়োগের নীতি, পরস্পর সাংঘর্ষিক দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা অগ্রাধিকার দানের নিয়মকানুন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত থাকতে হবে।

৭. ইমামগণের উদ্ধৃত মাসায়েল ও ইখতিলাফ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান

একজন আলিমকে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ধৃত মাসায়েল ও ইখতিলাফ সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি তাদের মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। যেহেতু কারো পক্ষে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ধৃত সকল মাসায়েল ও ইখতিলাফ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, তাই অন্ততপক্ষে একজন আলিমকে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হতে হবে। তবে এসব গ্রন্থের সবকিছু মুখস্থ থাকা জরুরী নয়; বরং প্রয়োজনের সময় মাসআলা অনুসন্ধান করে সহজে সমাধান বের করতে পারার মতো যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট।

খ. একজন আলেমের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন

একজন প্রকৃত আলেমের জন্য শুধু একাডেমিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়; বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জন করাও অত্যন্ত জরুরি। কারণ ইলমের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় চরিত্র, তাকওয়া ও আমলের মাধ্যমে।

একজন আলেমের জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলাম শুধু তথ্যভিত্তিক জ্ঞান শিক্ষা দেয় না; বরং মানুষের অন্তর, চরিত্র ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষাও প্রদান করে। একজন আলেম যদি ইলম অর্জনের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র অর্জন না করেন, তাহলে তার জ্ঞান মানুষের জন্য পূর্ণ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

একজন প্রকৃত আলেমের অন্তরে আল্লাহভীতি, বিনয়, ইখলাস, ধৈর্য, সত্যবাদিতা ও দুনিয়াবিমুখতা থাকা প্রয়োজন। তিনি মানুষের সামনে শুধু কথার মাধ্যমে নয়; বরং নিজের চরিত্র ও আমলের মাধ্যমেও ইসলামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।কারণ একজন আলেম শুধু শিক্ষক নন; তিনি সমাজের পথপ্রদর্শক। মানুষ তার কথা, চরিত্র ও জীবন দেখে দ্বীন শিখে। যদি আলেমের জ্ঞান থাকে কিন্তু আমল ও চরিত্র না থাকে, তাহলে তার ইলমের প্রভাব কমে যায়।তাই একজন আলেমের জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত অপরিহার্য।

১. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জন

একজন আলেমের সবচেয়ে বড় গুণ হলো তাকওয়া। কারণ যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর ভয় শেখায় না, সে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না। প্রকৃত আলেম সর্বদা অনুভব করেন যে আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার কথা ও কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

২. ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

একজন আলেমের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মানুষকে দেখানো, খ্যাতি অর্জন বা দুনিয়াবি স্বার্থ লাভের জন্য ইলম অর্জন করলে সেই ইলম বরকতহীন হয়ে যায়।

প্রকৃত আলেম নিজের জ্ঞানকে আল্লাহর আমানত মনে করেন এবং তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেন।

৩. আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াহ)

একজন আলেমের অন্তর অহংকার, হিংসা, রিয়া, লোভ ও কপটতা থেকে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ অন্তর শুদ্ধ না হলে জ্ঞানের আলো মানুষের জীবনে সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না।

৪.বিনয় ও নম্রতা

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে অহংকারী নয়, বিনয়ী বানায়। একজন আলেম মানুষের সঙ্গে নম্র আচরণ করেন এবং নিজেকে সবসময় আল্লাহর মুখাপেক্ষী মনে করেন।

[প্রকৃত আলেমের সন্ধ্যানে]

আলেমের প্রকারভেদ:

ইসলামে আলেম বলতে তারাই যারা কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেন । আলেমদের কয়েকভাবে ভাগে ভাগ করা যায় : ক. আখেরাতমুখি আলেম, খ. দুনিয়ামুখি আলেম।

ক. আখেরাতমুখি আলেম :

যারা শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় জ্ঞান অর্জন করেন। কোরআন, হাদিস, ফিকহ, তাফসির, ইজমাহ, কিয়াস, ফাতাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকেন এবং সে গুলো নিজের জীবনে আমল করেন তাদেরকেই আখেরাতমুখি আলেম বলে।
তারা আল্লাহকে ভয় করে থাকেন, তারা আল্লাহর দেয়া আজাব সম্পর্কে জানেন এবং বিশ্বাস করেন আখিরাতে সবকিছুর আল্লাহ তায়ালা ফায়সালা করবেন কাউকে জান্নাত দিবেন তোহ কাউকে জাহান্নামের শাস্তি উপভোগ করার জন্য ফায়সালা করবেন। এমন আলেম শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জ্ঞান ল্যাব করে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন কেউ দায়ী হিসেবে, কেও মুহাদ্দিস হিসেবে, কেও খতিব হিসেবে,ফকিহ হিসেবে, কেও মুফতি হিসেবে কিন্তু সবই নিয়তের উপর এ নির্ভর করে । তারা আল্লাহর জন্য নিজের সারা জীবন কোরবান করে দেন একবারও নিজেদের কথা ভাবেন না তারা। তাদের মুল লক্ষই হচ্চে আল্লাহকে রাজি খুশি করা।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার লেখা হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগাহ বইয়ে অনেকাংশে উল্লেখ করেছেন যে শরিয়াতের জ্ঞান ছাড়া উম্মাহ সঠিক পথে থাকতে পারবে না। তাই এ শ্রেণীর আলেমরা দ্বীনের হিফাজতকারি হিসেবে কাজ করবেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এ তিনি বিশেষভাবে সুন্নাহ অনুশরণের ও গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসুল (সা:) এর জীবনী থেকে রাসুল (সা:) সুন্নাহ জীবিত করবেন মানুষদের মাঝে। প্রত্যেকটা জায়গায় সমাজকে সংস্কারক হিসেবে আল্লাহ এমন আলেম রেখেছেন।

তারা সমাজ থেকে বিদআত দূর করতে পারেন এবং কোরআন ও সুন্নাহ এর দিকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। ইলম শুধু মস্তিষ্কে নয় অন্তরেও যায়, এমন আলেরাই হচ্ছেন যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে জীবিত। আলেমরাই সব চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন অন্যান্য লোকদের থেকে।

কেবল তারাই হচ্চেন উজ্জল নক্ষত্র যারা মানুষদের আল্লাহর নূর সম্পর্কে অবগত করে থাকেন এবং নিজেরাও নিজেদের জীবনকে আল্লাহর নূর ধারা আলোকিত করেন ।

আখিরাতমুখি আলেমকে উম্মাহের জন্য বড় রহমত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

আখিরাতমুখী আলেমের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ইখলাস। তারা ইলম অর্জন করেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মানুষকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে। তাদের দাওয়াতের লক্ষ্য হয় মানুষের হৃদয়কে আল্লাহমুখী করা, নিজের ব্যক্তিত্ব বা প্রভাব বৃদ্ধি করা নয়। তাই তারা মানুষের প্রশংসা পেলে অহংকারে আক্রান্ত হন না এবং সমালোচনার কারণে সত্য বলা থেকে বিরতও হন না। তাঁদের অন্তর সবসময় এই অনুভূতিতে ভরপুর থাকে যে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতই চিরস্থায়ী। ফলে তাদের জীবনে সরলতা, বিনয় ও তাকওয়ার ছাপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

খ. দুনিয়ামুখি আলেম :

যারা দুনিয়ার খ্যাতি সম্মান অর্জন করার উদ্দেশ্য এ যারা অল্প কিছু জ্ঞান অর্জন আলেম হয় তাদেরকেই দুনিয়ামুখি আলেম বলে । তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রসংশা বেশি চান। তারা সত্য জানার পর স্বার্থের জন্য সত্য গোপন রাখেন, তারা আমলের চেয়ে বিতর্ক ও খ্যাতিকে গুরুত্ব দেন।

আজকের এই ফিতনার যুগে কে প্রকৃত আলেম তা বুঝা অনেক কঠিন যদিও তাদের আমল তাদের চরিত্রে ভেসে উঠে। তারা ইলমকে ইবাদত নয় বরং পেশা ও আধিপত্যের

মাধ্যম বানায়। এদের কাছে ইলম লক্ষ্য হিদায়াত নয় বরং প্রভাব থাকে। তাই তাদের বক্তব্যে অনেক সময় শব্দ থাকে, কিন্তু রুহ থাকে না জ্ঞান থাকে কিন্তু খুশু খুজুহ থাকে না। তারা তাদের নফসকে সংযত রাখে না তার ফলে তাদের ভিতরে অনেক কিছু চলে আসে তাদের মধ্যে অহংকার, খোব, হিংসা,রিয়া, দুনিয়ার প্রতি এক ধরনের লোভ চলে আসে।

সাধারন মানুষ যেহেতু আলেমদের অনুসরন করে, তারা নিজেরাই দুনিয়াবি লোভে আক্রান্ত হয়, তখন মানুষও দীনকে দুনিয়াবি স্বার্থ অর্জনের মাধ্যম মনে করতে শুরু করে। এর ফলে, মানুষ আখিরাতমুখি থেকে দূরে সরে গিয়ে দুনিয়ার স্বার্থ খোজে বেরায় এর ফলে ইখলাস কমে যায় এবং দীনের সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুনিয়ামুখি আলেমের বড় সমস্যা হচ্চে তারা জ্ঞান মুখে থাকে কিন্তু তারা অন্তরে আমল করে না।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেখিয়েছেন যে আল্লাহর নিকট সেই আলেমই মর্যাদাবান, যার ইলম তাকে তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। রাসূল ﷺ
সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যাক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন যোগ্য ইলম দুনিয়ার স্বার্থে শেখে সে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। এই কারণেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ এমন আলেম তৈরির কথা বলেছেন, যারা ইলমের সাথে ইখলাস, তাকওয়া, তাযকিয়া ও আলেমকে একত্র করবে। তার দৃষ্টিতে প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি যার জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে সমাজ নিয়ে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে এবং এবং উম্মাহর আত্মিক ও চারিত্রিক সংস্কারে ভূমিকা রাখে। প্রকৃত আলেমের জ্ঞান তারা আমল ও চরিত্রের প্রকাশ পায়। কিন্তু দুনিয়া মুখী আলিম এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার জ্ঞান মুখে সীমাবদ্ধ থাকে। সে মানুষকে তাকওয়ার কথা বলে কিন্তু নিজের অন্তর্কে দুনিয়ার লোভ থেকে মুক্ত করতে পারেনা। সে মানুষকে বিনয়ের শিক্ষা দিলে দেয় কিন্তু নিজের সম্মান ও প্রভাবের আকাজ্ক্ষায় আক্রান্ত থাকে। ফলে তার কথায় আধ্যাত্মিক প্রভাব সৃষ্টি হয় না, যা মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে।

দুনিয়ামুখী আলেমের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো তার অন্তরে ইখলাসের দুর্বলতা। সে বাহ্যিকভাবে ইলম শিক্ষা দিলেও অন্তরে মানুষের প্রশংসা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব পাওয়ার আকাজ্ক্ষা লুকিয়ে থাকে। ফলে তার ইবাদত, দাওয়াত ও বক্তব্যের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এমন ব্যক্তি হয়তো সুন্দর ভাষায় কথা বলে, কঠিন মাসআলা ব্যাখ্যা করে এবং বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করে; কিন্তু তার অন্তর আল্লাহর

ভয় দ্বারা পূর্ণ থাকে না। শাহ ওয়ালিউল্লাহর দৃষ্টিতে এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর, কারণ ইলম মানুষের অন্তরকে বিনয়ী করার বদলে যদি অহংকারী করে তোলে, তবে সেই ইলম মানুষের জন্য পরীক্ষায় পরিণত হয়।

একজন আলেমের ইলমি দায়িত্ব

একজন আলেমের ইলমি দায়িত্ব অত্যন্ত বড় ও সম্মানজনক। আলেম কেবল বই পড়ে জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি নন; বরং তিনি সমাজকে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ। ইসলামে ইলমকে নূর বলা হয়েছে, আর সেই নূর মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আলেমদের উপর অর্পিত।

ইসলামি জ্ঞানের ধারাবাহিকতা যুগে যুগে আলেমদের মাধ্যমেই টিকে আছে।

তাই একজন আলেমের প্রথম দায়িত্ব হলো সহীহ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। তাকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আকিদা, তাফসীর, ইসলামের ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর গভীর জ্ঞান রাখতে হয়। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নিজে পথ হারায়, তেমনি অন্যদেরও বিভ্রান্ত করে।

আলেমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো ইলম অনুযায়ী আমল করা। যে আলেম মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা পালন করে না, তার কথা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলে না। তাই একজন আলেমকে তাকওয়া, ইখলাস, বিনয় ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। তার জীবনই মানুষের জন্য দাওয়াত হয়ে যায়। মানুষ আলেমের মুখের কথার চেয়ে তার চরিত্র থেকে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে।

এজন্য একজন আলেমের আচরণ, কথা, পোশাক, লেনদেন ও আচার-ব্যবহারে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া উচিত।

একজন আলেমের ইলমি দায়িত্বের মধ্যে দাওয়াত ও শিক্ষা দানও অন্তর্ভুক্ত। তাকে ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে হয়। শিশুদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া, যুবকদের চরিত্র গঠন করা, পরিবারকে ইসলামী আদর্শ শেখানো এবং সমাজকে নৈতিকতার দিকে আহ্বান করা—এসবই আলেমের দায়িত্ব। তিনি

মানুষকে শুধু ইবাদতের শিক্ষা দেন না; বরং মানবতা, ন্যায়বিচার, দয়া, সততা ও আখিরাতমুখী জীবনের শিক্ষাও দেন।

সমাজে যখন ফিতনা, অন্যায় ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়, তখন আলেমের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। তাকে সত্য কথা বলতে হয়, মানুষকে অন্যায় থেকে সতর্ক করতে হয় এবং আল্লাহভীতির দিকে আহ্বান করতে হয়। একজন আলেম যদি দুনিয়ার ভয় বা মানুষের সন্তুষ্টির জন্য সত্য গোপন করেন, তাহলে তিনি তার দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করতে পারেন না। প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি, যিনি কষ্ট হলেও হক কথা বলেন এবং মানুষকে সঠিক পথে ডাকেন।

একজন আলেমের দায়িত্ব কেবল মসজিদ বা মাদরাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাকে সমাজের অবস্থা বুঝতে হয় এবং মানুষের সমস্যার ইসলামী সমাধান তুলে ধরতে হয়। বর্তমান যুগে নানা ধরনের বিভ্রান্তি, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ছে। তাই একজন আলেমকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এসবের মোকাবিলা করতে হয়। তিনি মানুষকে বুঝান যে ইসলাম শুধু কিছু ইবাদতের নাম নয়; বরং এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

একজন আলেমের সবচেয়ে বড় ইলমি দায়িত্ব হলো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি করা। তিনি মানুষকে দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে শিক্ষা দেন। প্রকৃত আলেম উম্মাহর পথপ্রদর্শক, সমাজের সংশোধনকারী এবং নবীদের উত্তরাধিকারী। তার ইলম যদি ইখলাস ও আমলের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সেই ইলম পুরো সমাজকে আলোকিত করতে পারে।

একজন আলেমের দায়িত্ব কেবল মসজিদ বা মাদরাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাকে সমাজের অবস্থা বুঝতে হয় এবং মানুষের সমস্যার ইসলামী সমাধান তুলে ধরতে হয়। বর্তমান যুগে নানা ধরনের বিভ্রান্তি, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ছে। তাই একজন আলেমকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এসবের মোকাবিলা করতে হয়। তিনি মানুষকে বুঝান যে ইসলাম শুধু কিছু ইবাদতের নাম নয়; বরং এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

একজন আলেমের সবচেয়ে বড় ইলমি দায়িত্ব হলো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি করা। তিনি মানুষকে দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে শিক্ষা দেন। প্রকৃত আলেম উম্মাহর পথপ্রদর্শক, সমাজের সংশোধনকারী এবং নবীদের উত্তরাধিকারী। তার ইলম যদি ইখলাস ও আমলের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সেই ইলম পুরো সমাজকে আলোকিত করতে পারে।

একজন আলেমের আরেকটি দায়িত্ব হলো সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেওয়া। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে এমন কিছু মানুষ ছিল যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। কেউ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, কেউ হাদীসকে অস্বীকার করেছে, আবার কেউ ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এসব ক্ষেত্রে আলেমদের দায়িত্ব হলো প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষের সামনে দ্বীনের বিশুদ্ধ রূপ তুলে ধরা। তারা ইসলামের রক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং জ্ঞানের মাধ্যমে বিভ্রান্তির মোকাবিলা করেন।

একজন আলেমের ইলমি দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনের আমানত রক্ষা করা। তিনি নিজের জীবন, সময় ও শ্রমকে সত্যের প্রচার, মানুষের হিদায়াত এবং ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেন। তার জ্ঞান কেবল মুখস্থ কিছু তথ্য নয়; বরং মানুষের জীবন পরিবর্তনের শক্তি। যখন একজন আলেম নিষ্ঠা, ইখলাস ও তাকওয়ার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেন, তখন তিনি শুধু একজন শিক্ষক নন; বরং পুরো সমাজের জন্য রহমত, পথপ্রদর্শক এবং কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠেন।

তিনি কেবল শিক্ষক নন, বরং পথপ্রদর্শক; কেবল বক্তা নন, বরং সমাজসংস্কারক; কেবল জ্ঞানী নন, বরং আমানতদার। তার দায়িত্ব হলো সত্যকে জানা, সত্যের উপর আমল করা, সত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সত্যের উপর মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা। এই মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলে একজন আলেম ব্যক্তি, সমাজ ও উম্মাহর জন্য বিরাট কল্যাণের কারণ হয়ে ওঠেন।

সমাজ সংস্কারে আলেমের দায়িত্ব

সমাজ-সংস্কারে একজন আলেমের দায়িত্ব কেবল মসজিদে ওয়াজ করা বা ধর্মীয় মাসআলা বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথপ্রদর্শক। একজন প্রকৃত আলেম মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্র গঠনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। তিনি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, বিদআত, অন্যায়, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তাঁর জ্ঞান মানুষের জীবনকে আল্লাহমুখী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, ব্যক্তিগত খ্যাতি বা পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়।

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে আলেম মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, সততা, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত সকলকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আহ্বান জানান এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। একজন আলেমের অন্যতম দায়িত্ব হলো মানুষের হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি করা, যাতে সমাজের পরিবর্তন কেবল বাহ্যিক না হয়ে অন্তর থেকেও আসে। কারণ ইসলামী দৃষ্টিতে প্রকৃত সংস্কার শুরু হয় মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এছাড়া আলেম নতুন প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষা ও আদর্শের দিকে পরিচালিত করেন। তিনি তরুণদের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা, নাস্তিকতা, ভোগবাদ ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করেন। তাঁর দায়িত্ব হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে আল্লাহর আনুগত্য, মানবকল্যাণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই একজন প্রকৃত আলেম সমাজের সংস্কারক, পথপ্রদর্শক এবং উম্মাহর কল্যাণকামী নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।
একজন আলেমের দায়িত্ব হলো মানুষকে কেবল ইবাদতের নিয়ম শেখানো নয়; বরং তাদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়া। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, আর সেই জীবনব্যবস্থার সঠিক পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরা আলেমদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সমাজ-সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। একজন প্রকৃত আলেম কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ, ভয় বা লোভের কারণে সত্য গোপন করেন না। তিনি অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়ান, জালিমকে সতর্ক করেন এবং সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে দুনিয়ার ক্ষমতা ও সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহর দরবারে প্রত্যেককে নিজের কাজের হিসাব দিতে হবে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মতবাদ, ভোগবাদী চিন্তা ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করা আলেমদের অন্যতম বড় দায়িত্ব। তারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে যুবসমাজকে এমন পথে পরিচালিত করেন, যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে একজন আলেমের দায়িত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁকে একটি জাতির বিবেক বলা যায়। যখন সমাজে মানুষের নৈতিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং পার্থিব স্বার্থ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, তখন একজন আলেম তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। তিনি মানুষের সামনে এমন এক জীবনাদর্শ উপস্থাপন করেন, যা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আল্লাহর বিধানের অধীন করার শিক্ষা দেয়। একজন প্রকৃত আলেম উপলব্ধি করেন যে সমাজের অসংখ্য সমস্যা মূলত মানুষের অন্তরের রোগ থেকে জন্ম নেয়। তাই তিনি বাহ্যিক সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি মানুষের হৃদয়ের অহংকার, হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা ও দুনিয়াপ্রীতির মতো আধ্যাত্মিক ব্যাধিগুলো দূর করার জন্য কাজ করেন।

একজন আলেম সমাজে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যও নিরলস চেষ্টা করেন। তিনি মানুষকে বিভেদ, হিংসা, দলাদলি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন। তিনি বুঝতে পারেন যে বিভক্ত ও বিবাদপূর্ণ সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। তাই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার গুণাবলি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। যখন

সমাজে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন তিনি ন্যায়সঙ্গত ও জ্ঞানপূর্ণ সমাধানের পথ দেখান। তাঁর উপস্থিতি সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মানুষকে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

একজন আলেমের সমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব হলো মানুষের জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারে। তিনি কেবল বক্তা নন, তিনি একজন আদর্শ, একজন শিক্ষক, একজন পথপ্রদর্শক এবং একজন সংস্কারক। তাঁর জ্ঞান যদি আমলের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁর দাওয়াত যদি আন্তরিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাঁর মাধ্যমে একটি সমাজ পরিবর্তিত হতে পারে, একটি জাতি জাগ্রত হতে পারে এবং অসংখ্য মানুষ হেদায়েতের আলো লাভ করতে পারে।

এজন্যই ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত আলেমগণকে নবীদের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে; কারণ তাঁরা নবীদের মিশন—মানুষের সংশোধন, শিক্ষা ও কল্যাণ সাধনের কাজ—অব্যাহত রাখেন।একজন আলেম সমাজের আত্মিক চিকিৎসক ও নৈতিক সংস্কারক। তিনি মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর অনুসরণ এবং আখিরাতে জবাবদিহিতা অনুভূতি জাগিয়া তুলেন। তার জ্ঞান আমল দাওয়াত ও আদর্শের মাধ্যমে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ন্যায় বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই একজন প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব কেবল মসজিদ বা মাদ্রাসার গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সমগ্র সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা মানুষের জীবনকে কল্যাণমুখী করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করায় তার মহান দায়িত্ব।

[প্রকৃত আলেমের সন্ধানে]

দাওয়াহ্ ও আমর বিল মারুফ

দাওয়াহ অর্থ শুধু মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকাই নয়, বরং তাদের হৃদয়ে ঈমানের আলো জাগিয়ে তোলা, আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব বোঝানো এবং নৈতিক জীবন গঠনে সাহায্য করা

আমর বিল মারুফ অর্থ মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং নৈতিকতার পথে উৎসাহিত করা।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-এর দৃষ্টিতে একজন প্রকৃত আলেমের উচিত দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফকে নিজের জীবনের প্রধান দায়িত্বগুলোর একটি মনে করা। তিনি শুধু জ্ঞান অর্জন করবেন না; বরং সেই জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, তাদের ভুল সংশোধন করবেন, সৎকাজে উৎসাহিত করবেন এবং নিজের চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরবেন। কারণ মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে একজন আলেমের বাস্তব জীবন ও আমল।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর চিন্তাধারায় দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফ হলো নবীদের মিশনের ধারাবাহিকতা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সংশোধিত হয়, পরিবার সুন্দর হয়, সমাজ কল্যাণময় হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। যে আলেম এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে নবীদের উত্তরাধিকার বহন করেন এবং উম্মাহর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দাওয়াহর উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান বিতরণ নয়; বরং মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, তাকওয়া এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করা। একজন দাঈ বা আলেম যখন মানুষের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা তুলে ধরেন, তখন তিনি শুধু তথ্য প্রদান করেন না; বরং মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। কারণ বাহ্যিক সংশোধনের আগে অভ্যন্তরীণ সংশোধন জরুরি। মানুষের হৃদয়ে ঈমান শক্তিশালী হলে তার আমলও সুন্দর হয়ে ওঠে।

আমর বিল মারুফের গুরুত্ব সম্পর্কে

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন,
সমাজে সৎকাজের নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান না করলে নৈতিক অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। মানুষ যখন অন্যকে ভালো কাজ করতে দেখে এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত হয়, তখন তার মধ্যেও সেই ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এভাবেই একটি নেককার সমাজ গড়ে ওঠে। তাই আমর বিল মারুফ শুধু একটি ব্যক্তিগত কর্তব্য নয়; বরং সামষ্টিক কল্যাণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফের কাজ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে করতে হবে। কারণ সব মানুষের মানসিকতা এক নয়। কারও কাছে কোমল ভাষায় উপদেশ কার্যকর হয়, আবার কারও ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। একজন আলেমের উচিত মানুষের অবস্থা, জ্ঞান ও প্রয়োজন বুঝে তাদের কাছে দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এটাই নববী পদ্ধতি এবং সফল দাওয়াহর অন্যতম রহস্য।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*-এ এমন একটি সমাজব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লাহর বিধান কার্যকর থাকে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফকে অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবগতভাবে ভুল করতে পারে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে পারে এবং কখনো কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এমন একদল মানুষ সৃষ্টি করেছেন যারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার মাধ্যমে অন্যদের পথপ্রদর্শন করবে। এই দায়িত্ব মূলত নবীদের ছিল, আর নবীদের পর তা আলেমদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আমর বিল মারুফ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এমন ধারণা প্রদান করেন যে, এটি সমাজের নৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যেমন একটি শহরকে রক্ষা করার জন্য প্রহরী প্রয়োজন, তেমনি একটি সমাজকে পাপ ও অন্যায় থেকে রক্ষা করার জন্য সৎকাজের আদেশ এবং কল্যাণের প্রচার প্রয়োজন। যদি সমাজে কেউ ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ না দেয়, তবে মানুষ ধীরে ধীরে গাফেল হয়ে পড়বে। কিন্তু যখন নেককার মানুষরা অন্যদেরকে নামাজ, সততা, দান-সদকা, ন্যায়বিচার ও উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করে, তখন সমাজে কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-এর আলোকে দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফ হলো উম্মাহর জীবনশক্তি। এর মাধ্যমে ঈমান সংরক্ষিত হয়, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ সংস্কার হয় এবং মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে পরিচালিত হয়। একজন প্রকৃত আলেমের মর্যাদা ও গুরুত্বও এখানেই যে, তিনি নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মানুষের মধ্যে কল্যাণ ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে আহ্বান করেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*-এ এমন একটি সমাজব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লাহর বিধান কার্যকর থাকে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফকে অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবগতভাবে ভুল করতে পারে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে পারে এবং কখনো কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এমন একদল মানুষ সৃষ্টি করেছেন যারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার মাধ্যমে অন্যদের পথপ্রদর্শন করবে। এই দায়িত্ব মূলত নবীদের ছিল, আর নবীদের পর তা আলেমদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

আমর বিল মারুফ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এমন ধারণা প্রদান করেন যে, এটি সমাজের নৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যেমন একটি শহরকে রক্ষা করার জন্য প্রহরী প্রয়োজন, তেমনি একটি সমাজকে পাপ ও অন্যায় থেকে রক্ষা করার জন্য সৎকাজের আদেশ এবং কল্যাণের প্রচার প্রয়োজন। যদি সমাজে কেউ ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ না দেয়, তবে মানুষ ধীরে ধীরে গাফেল হয়ে পড়বে। কিন্তু যখন নেককার মানুষরা অন্যদেরকে নামাজ, সততা, দান-সদকা, ন্যায়বিচার ও উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করে, তখন সমাজে কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-এর আলোকে দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফ হলো উম্মাহর জীবনশক্তি। এর মাধ্যমে ঈমান সংরক্ষিত হয়, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ সংস্কার হয় এবং মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে পরিচালিত হয়। একজন প্রকৃত আলেমের মর্যাদা ও গুরুত্বও এখানেই যে, তিনি নবীদের

উত্তরাধিকারী হিসেবে মানুষের মধ্যে কল্যাণ ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে আহ্বান করেন।

হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগাহ এর আলোকে, দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফ শুধু একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়; বরং এটি মানবজাতির হিদায়াত, সমাজের নৈতিক উন্নয়ন এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার একটি মৌলিক মাধ্যম। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) দেখিয়েছেন যে, মানুষের প্রকৃত সফলতা দুনিয়াবি অর্জনে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তির মধ্যে নিহিত। আর এই সফলতার পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্যই দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণ তাঁদের জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে এই দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে আলেমদের ওপরও একই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

দাওয়াহ মানুষের হৃদয়ে ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহভীতি জাগ্রত করে, আর আমর বিল মারুফ সমাজে ন্যায়, সততা, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। যখন এই দুটি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়, তখন ব্যক্তি সংশোধিত হয়, পরিবার সুসংগঠিত হয় এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে যখন মানুষ দাওয়াহ ও আমর বিল মারুফকে উপেক্ষা করে, তখন সমাজে গাফিলতি, অন্যায়, পাপাচার ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। তাই ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব ও সুস্থতা অনেকাংশে এই মহান দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভরশীল।

নেতৃত্ব ও শূরার দায়িত্ব

নেতৃত্ব ও শূরা ইসলামী সমাজব্যবস্থার দুটি অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. দেখিয়েছেন যে, মানবসমাজের সুশৃঙ্খল পরিচালনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং দ্বীনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য। কিন্তু সেই নেতৃত্ব কখনো স্বেচ্ছাচারী বা একক সিদ্ধান্তনির্ভর হতে পারে না; বরং তা শূরা, পরামর্শ, প্রজ্ঞা ও সমষ্টিগত কল্যাণের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। কারণ একজন মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হলেও পরামর্শের মাধ্যমে বহু মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটে, যা সমাজকে অধিকতর সঠিক ও কল্যাণকর পথে পরিচালিত করে।

একজন প্রকৃত নেতা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ, খ্যাতি বা ক্ষমতার মোহে পরিচালিত হন না; বরং তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষের কল্যাণ সাধনকে নিজের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি জনগণের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করেন, তাদের সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকেন এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। শূরার মাধ্যমে তিনি সমাজের জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করেন এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা ব্যক্তিগত নয় বরং সামষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। এর ফলে সমাজে আস্থা, ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর দৃষ্টিতে নেতৃত্ব কেবল প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বও বটে। একজন নেতার চরিত্র, তাকওয়া, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা পুরো সমাজকে প্রভাবিত করে। নেতা যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হন, তবে সমাজেও নৈতিকতা, সততা ও কল্যাণের বিকাশ ঘটে। আর যদি নেতৃত্ব দুর্বল, অন্যায়পরায়ণ বা স্বার্থপর হয়ে যায়, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা, অবিচার ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। এজন্য ইসলামে নেতৃত্বকে একদিকে সম্মানের মর্যাদা দেওয়া হলেও অন্যদিকে এটিকে অত্যন্ত বড় আমানত ও জবাবদিহিতার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-এর শিক্ষা অনুযায়ী নেতৃত্ব ও শূরার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের অধিকার সংরক্ষিত

থাকবে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল্যায়ন হবে এবং সকল কার্যক্রম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। একজন আদর্শ নেতা শূরার মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করেন, তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করেন এবং সমাজকে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নতির পথে পরিচালিত করেন। এভাবেই নেতৃত্ব ও শূরা ইসলামী সভ্যতার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং উম্মাহর দুনিয়াবি ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে।

শূরার মূল শিক্ষা হলো, কোনো ব্যক্তি যত জ্ঞানী বা অভিজ্ঞই হোক না কেন, সে ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্য, বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক। এই নীতির মাধ্যমে ইসলাম নেতৃত্বকে একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত করেছে এবং জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক শাসনের পথ উন্মুক্ত করেছে। শূরার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত মূল্যায়িত হয়, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও দূরদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নেতৃত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উম্মাহর ঐক্য সংরক্ষণ করা। একজন নেতা যদি ন্যায়বিচার, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, তবে সমাজে বিভেদ, হিংসা ও বিশৃঙ্খলা কমে যায়। মানুষ একে অপরের প্রতি আস্থা অর্জন করে এবং একটি শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, নেতৃত্বে অন্যায়, স্বার্থপরতা ও পরামর্শহীনতা দেখা দিলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে, মতবিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং সামষ্টিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই একজন নেতার জন্য কেবল প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, নৈতিক দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও অপরিহার্য।

নেতৃত্বের প্রকৃত সাফল্য পরিমাপ করা হয় জনগণের কল্যাণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একজন নেতা তখনই সফল বলে গণ্য হবেন, যখন তিনি দুর্বল ও শক্তিশালী সবার জন্য সমানভাবে ন্যায় নিশ্চিত করবেন, মানুষের অধিকার রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন। একইভাবে শূরার সফলতা তখনই প্রতিফলিত হবে, যখন তা কেবল আনুষ্ঠানিকতা না হয়ে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

নেতৃত্ব হলো আমানত, শূরা হলো সেই আমানত রক্ষার উপায়, আর ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ হলো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। একজন নেতা ও আলেমের উচিত শূরার নীতি

অনুসরণ করে সমাজকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এভাবেই ইসলামী নেতৃত্ব মানুষের পার্থিব জীবনকে সুশৃঙ্খল করে এবং আখিরাতের মুক্তির পথ সুগম করে। নেতৃত্ব ও শূরার এই সমন্বিত ব্যবস্থা কেবল একটি প্রশাসনিক কাঠামো নয়; বরং এটি ইসলামের সামগ্রিক সামাজিক দর্শনের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন, যা যুগে যুগে মুসলিম সমাজকে ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও উন্নতির পথে পরিচালিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে সক্ষম।

নেতৃত্ব ও শূরার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এমন একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা, যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। এভাবেই নেতৃত্ব ও শূরা ইসলামী সভ্যতার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করে। এই মহান নীতিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি সমাজ প্রকৃত শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নতি এবং আল্লাহর রহমত লাভ করতে সক্ষম হয়।

[হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগাহ]

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি বলতে মানুষের নফস ও অন্তরকে সকল প্রকার নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক রোগ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকে বোঝায়। মানুষের হৃদয়ে জন্মগতভাবে কিছু প্রবৃত্তি থাকে, যেগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হলে তাকে পাপ, অন্যায় ও অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যেমন—অহংকার, হিংসা, লোভ, কৃপণতা, রিয়া, আত্মপ্রশংসা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ইত্যাদি। এসব প্রবৃত্তি মানুষের আত্মাকে দুর্বল করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

মানুষের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন সে নিজের অন্তরের রোগগুলোকে চিহ্নিত করে এবং সেগুলো দূর করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে। কারণ অন্তরই মানুষের সমস্ত কাজের কেন্দ্র। অন্তর বিশুদ্ধ হলে আমল বিশুদ্ধ হয়, আর অন্তর কলুষিত হলে বাহ্যিক আমলও তার প্রকৃত মূল্য হারায়।

শরিয়তের প্রতিটি বিধানের পেছনে মানুষের কল্যাণ এবং আত্মশুদ্ধির গভীর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে, সাওম নফসের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, যাকাত লোভ ও কৃপণতা দূর করে, হজ মানুষের মধ্যে বিনয় ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ প্রতিটি ইবাদত মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্য একেকটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

মানুষের অন্তরে অহংকার, হিংসা, লোভ, রিয়া (লোক দেখানো), আত্মপ্রশংসা, ক্রোধ, কৃপণতা, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি ইত্যাদি নানা ধরনের রোগ বাসা বাঁধে। এসব রোগ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আত্মশুদ্ধি হলো এসব দোষ-ত্রুটি দূর করে অন্তরকে ঈমান, ইখলাস, তাকওয়া, ধৈর্য, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দয়া ও আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা সুশোভিত করা।

প্রকৃত আত্মশুদ্ধি তখনই অর্জিত হয়, যখন মানুষ শুধু বাহ্যিকভাবে নেক আমল করে না; বরং তার অন্তরও আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও আনুগত্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে নিজের ভুল-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে, নফসের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।

সুতরাং, আত্মশুদ্ধির প্রকৃত অর্থ হলো নিজের অন্তর ও চরিত্রকে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক রোগ থেকে মুক্ত করে আল্লাহভীতি, ইখলাস, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অলংকৃত করা, যাতে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

তাকওয়া

তাকওয়া ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। তাকওয়া হলো আল্লাহর প্রতি এমন সচেতনতা ও ভয়, যা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং নেক কাজে উৎসাহিত করে। এটি শুধু ভয় নয়; বরং ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আশা এবং জবাবদিহিতার অনুভূতির সমন্বয়।

তাকওয়া শুধু বাহ্যিক আচরণ নয়; এটি মানুষের অন্তরের এমন একটি অবস্থা, যেখানে সে সর্বদা অনুভব করে যে আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার কথা শুনছেন এবং তার প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন।

তাকওয়া মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম। একজন মুত্তাকি ব্যক্তি একান্তে ও প্রকাশ্যে একই রকম আল্লাহভীরু থাকে। সে জানে যে আল্লাহ তার প্রতিটি কাজ সম্পর্কে অবগত।

তাকওয়া মানুষের চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। একজন মুত্তাকি ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, আমানত রক্ষা করে, মানুষের অধিকার আদায় করে, অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে ন্যায়কে প্রাধান্য দেয়। তার অন্তরে অহংকারের পরিবর্তে বিনয়, হিংসার পরিবর্তে শুভকামনা এবং প্রতিহিংসার পরিবর্তে ক্ষমাশীলতা জন্ম নেয়।

তাকওয়ার কারণে মানুষ তার জিহ্বাকে মিথ্যা, গীবত ও অপবাদ থেকে রক্ষা করে। তার চোখ হারাম থেকে সংযত থাকে এবং তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। এভাবে তাকওয়া কেবল একটি আধ্যাত্মিক গুণ নয়; বরং এটি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তন করে দেয়।

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার সম্পর্ক

আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নফস) এবং তাকওয়া একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ দুটির সম্পর্ক এমন যে, একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণতা লাভ করে না। আত্মশুদ্ধি হলো অন্তরকে পাপ, কুপ্রবৃত্তি ও নৈতিক ব্যাধি থেকে পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া, আর তাকওয়া হলো সেই পরিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহভীতি, আল্লাহর মহব্বত এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার স্থায়ী গুণের নাম।

আত্মশুদ্ধি হলো তাকওয়ার ভিত্তি, আর তাকওয়া হলো আত্মশুদ্ধির ফল ও রক্ষাকবচ। আত্মশুদ্ধি মানুষকে তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়, আর তাকওয়া মানুষকে আরও বেশি আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর করে। এই দুই গুণের সমন্বয়েই একজন বান্দা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপযুক্ত হয়।

[হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগাহ]

উম্মাহর ঐক্য রক্ষা

উম্মাহর ঐক্য রক্ষা একজন প্রকৃত আলেমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলাম মুসলিমদেরকে বিভক্তি, দলাদলি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।এই আয়াত মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মৌলিক ভিত্তি নির্দেশ করে।

একজন প্রকৃত আলেম কখনো অপ্রয়োজনীয় মতভেদকে সংঘাতে রূপ দেন না। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষকে সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্মানের শিক্ষা দেন। তিনি জানেন যে, ফিকহি মতভেদ বা ইজতিহাদি পার্থক্য ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এসব পার্থক্য কখনো উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করার কারণ হওয়া উচিত নয়। তাই তিনি মতভেদের আদব শিক্ষা দেন এবং মুসলিমদেরকে সাধারণ কল্যাণের বিষয়ে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান।

উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্য আলেমকে ন্যায়পরায়ণ, দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান হতে হয়। তিনি কোনো নির্দিষ্ট দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অন্ধ সমর্থক না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর লক্ষ্য থাকে মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, অপবাদ, গীবত এবং পারস্পরিক শত্রুতা থেকে মানুষকে সতর্ক করেন, কারণ এসব বিষয় উম্মাহর শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

উপসংহার

সর্বোপরি বলা যায়, প্রকৃত আলেম কেবল জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি নন; বরং তিনি নবীদের উত্তরাধিকার বহনকারী, দ্বীনের রক্ষক, সমাজের সংস্কারক এবং মানবজাতির কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক। কুরআন ও হাদিসে আলেমদের যে মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের জ্ঞানের কারণে নয়; বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা, মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করার কারণে।

আল্লাহ তাআলা মানবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার পর আলেমগণই সেই মহান দায়িত্বের উত্তরাধিকারী হন। তাই একজন প্রকৃত আলেমের কাজ শুধু মাসআলা বর্ণনা করা নয়; বরং মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, তাকওয়া সৃষ্টি করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সমাজকে অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা এবং মানুষকে আল্লাহমুখী জীবন গঠনে সহায়তা করা।

কুরআনের আলোকে প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করেন, আর হাদিসের আলোকে তিনি নবীদের উত্তরাধিকারী।

অতএব, একজন প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব হলো—দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার করা, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সমাজে ন্যায় ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা, মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করা, ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সর্বোপরি নিজের জীবনকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলে উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই একজন আলেম প্রকৃত অর্থে নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করবেন।